দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 3.0 JUL 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

পরীক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষার লক্ষ্য

এসএসসি পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে দ্বিধা–দ্বন্দ্ব আর সমালোচনার নিরসন ঘটতে যাচ্ছে। সরকার এসএসসি পরীক্ষার নতুন নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। এ নিয়ম চালু হবে উনিশ শ' ছিয়ানব্বই থেকে। অর্থাৎ এখন যারা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে তাদের থেকেই শুরু হবে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি। সোজা কথায় বলতে গেলে, শিক্ষার্থীদের মানসিক ও অন্যবিধ যাবতীয় প্রস্তুতির সুযোগ এতে রাখা হয়েছে। ফলে কোনো মহলেরই তেমন কোনো আপত্তির কারণ থাকবে না বলেই আমরা মনে করি।

এসএসসি পরীক্ষায় পদ্ধতিগত এ পরিবর্তন খুব গুরুতর কিছু না। পরীক্ষা নেয়ার পদ্ধতি একই থাকছে। পরিবর্তনটা আসছে প্রশ্ন আর নম্বর বন্টনের ক্ষেত্রে। এর সার কথা হচ্ছে এই, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রশ্ন ব্যাংকের পাঁচশ' প্রশ্ন তখন নেহাত আদর্শ বা নমুনা প্রশ্ন হিসেবেই বিবেচিত হবে। সব প্রশ্ন এর থেকেই দিতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা ৯৬ সাল থেকে উঠে যাবে। পাঠ্যসূচী থেকে এ আদর্শ অনুযায়ী অন্য প্রশ্নও দেয়া যাবে।

নম্বর বন্টনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা হবে এই, নৈর্ব্যক্তিক এবং বর্ণনামূলক প্রশ্নে আলাদাভাবে পাস করতে হবে। মানবিক বিভাগে পাসের জন্যে প্রতি বিভাগে ন্যূনতম পনেরো এবং মোট তেত্রিশ নম্বর পাওয়া পাসের জন্যে আবশ্যক। বিজ্ঞানে নৈর্ব্যক্তিক এবং বর্ণনামূলক বিভাগে যথাক্রমে সাড়ে সাইত্রিশ নম্বরের মধ্যে বারো করে এবং হাতে–কলমের পরীক্ষায় পঁচিশের মধ্যে অন্তত নয়, মোট এই তেত্রিশ নম্বর পেতে হবে।

এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রবর্তনের পর এ পরীক্ষা পদ্ধতির যৌক্তিকতা–গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যে তীব্র সমালোচনার সূত্রপাত ঘটে তার পরিপ্রেক্ষিতে এটুকু পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রশ্নব্যাংকের পাঁচ শ' প্রশ্নে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং বর্ণনামূলক বিভাগে পাসের বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে অভিযোগ ওঠে যে ফেল করা শিক্ষার্থীরাও প্রথম বিভাগে উৎরে যাচ্ছে। বিভিন্ন আলোচনায় এসব অভিযোগ পর্যাপ্ত তথ্য দ্বারাও প্রমাণ করা হয়। বিভিন্ন মহল থেকেই তাই এ পদ্ধতি বদলের দাবি ওঠে।

পরীক্ষার্থীরা উচ্চতর বিভাগের সম্মান পাবে, আপত্তি এ নিয়ে নয়। আপত্তির মূল কারণ হচ্ছে পরীক্ষার মূল লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে যাওয়া নিয়ে। দশ বছরের শিক্ষাসূচী শেষ করে একটি জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার কষ্টসাধ্য আয়োজনের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করা, তাদের পরবর্তী বা উচ্চতর ধাপে এগিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র দেয়া। কিন্তু পাঁচশ প্রশ্ন আর তার সংক্ষিপ্ত উত্তর বুঝে না বুঝে মুখস্থ করে যদি পঞ্চাশ নম্বর পাওয়া যায়, তাতে পঠন–পাঠনের মান কিছুই যাচাই হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা যায়, দশ বছরের শিক্ষাসূচীতে শিক্ষার্থীদের কিছুই শেখা হয় না। মামুলী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এক কথায় বলতে গেলে শিক্ষার মান যাচাইয়ের আয়োজন পরীক্ষা পদ্ধতিগত সামান্য গলদের জন্যে শিক্ষার সামান্যতম মানও অবশিষ্ট রাখেনি। আমাদের এসএসসি পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ও বিশ্বাসযোগ্যতাহীন হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় প্রতিবাদ ওঠাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন মহল থেকেই প্রতিবাদ ওঠে। তারই পরিণতি এই পরিবর্তন।

শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষার অবকাশ যেমন আছে, তেমনি তার প্রয়োজনও রয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষার অধিকার কারো থাকতে পারে না। এই সাধারণ সত্যটি বুঝতে ভুল করার ফলেই আমরা বিপত্তিটি বাধিয়েছিলাম। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করার আগে বিপদের কিংবা এর সর্বনাশা প্রভাবের সীমা খতিয়ে দেখা হয়নি বলেই সবচে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষাটি এমন খেলো ব্যাপারে পরিণত হতে পেরেছে। বলতে গেলে শিক্ষার এ আয়োজনকেই অর্থহীন করে তুলেছে। পরিবর্তন নিয়ে তাই দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে না। আর যেহেতু তোগলকী সিদ্ধান্ত বা খামখেয়ালীর অবকাশ এতে নেই, নতুন সিদ্ধান্ত উপযুক্ত সময় দিয়ে কার্যকর করাই সঙ্গত।

আমরা আশা করবো, আমাদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দ এ সিদ্ধান্তটির গুরুত্ব অনুধাবন করে এর প্রবর্তনায় কার্যকর অবদান রাখবেন। পরীক্ষা নেহাত সনদ সংগ্রহের মাধ্যম না হয়ে শিক্ষার প্রকৃত মানের সূচক হয়ে উঠুক। যার প্রধান শর্ত হচ্ছে পঠন–পাঠন। কতিপয় প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষা–বৈতরণী পাড়ি দেয়া যায় ঠিকই, সে প্রশ্নগুলো আগ থেকে চিহ্নিত করে দিলে কাজটি আরও সহজ হয়। এতেও সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পরিণতি যে ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায় সে অভিজ্ঞতা আমাদের এরই মাঝে বিস্তর স্ফীত হয়ে উঠেছে। এ ভার থেকে আমাদের অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে এর আগে যে পরিবর্তনটি আসে তার পেছনেও বিস্তর দাবি ছিল। ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার অপূর্ণতা এবং ত্রুটি–বিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনার অন্ত ছিল না। 'কেরানী তৈরির কারখানা' নামে নিন্দিত শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবির সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতি পাল্টানোরও দাবি ওঠে। সংস্কারের চেষ্টা যে কিছুই হয়নি এমনও না। এযাবৎ অনেক কটি কমিশন সুপারিশ হয়ে গেছে। অনেকগুলোর আংশিক বাস্তবায়নও হয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতি পাল্টানোরও একটা পরীক্ষা হয়ে গেল এসএসসিকে অবলম্বন করে। এতসব কান্ডের পর আমাদের প্রাপ্তিটা কি দাঁড়িয়েছে?

অনেককেই আজ আক্ষেপ করতে দেখা যায়, আগেই বরং ছিল ভাল। পাসের পর কাজের যোগ্যতা নিয়ে অন্তত প্রশ্ন উঠতো না। আর প্রকৃত অর্থে শিক্ষিতও যে একান্তই বেরুত না, তা–ও নয়।

এমন আক্ষেপের সত্যতা আপেক্ষিক মাত্র। কেননা, ব্যতিক্রম যেমন আগে ছিল, এখনো আছে। সব সমালোচনা সত্ত্বেও এখনো যে কিছু অসাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থী বেরিয়ে আসছে, এ সত্যও অনস্বীকার্য। ব্যতিক্রম দিয়ে অবশ্যি কোনো পদ্ধতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায় না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক মূল্যায়ন থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর তেমন অবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় থাকে না।

অন্য বিবেচনাতেও সংস্কার জরুরী হয়ে উঠেছে। সে হচ্ছে গোটা বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন। আমরা এমন এক সময়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি যখন প্রযুক্তিগত দক্ষতাই হবে আত্মরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। আর বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রযুক্তিতে দখল আসতে পারে উন্নত জ্ঞানের পথ ধরে। শিক্ষার মান বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একে বিজ্ঞানমুখী করে তোলাও তাই অপরিহার্য। অতএব সাবেকী ধ্যান–ধারণায় পরিবর্তন না এনে উপায় নেই।

এই পরিবর্তন আনার জন্যে পরীক্ষা–নিরীক্ষার প্রয়োজন আবশ্যক। আর এ পরীক্ষা যদি সরাসরি শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়েই করা হয়, তার ফল যে এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের মতই বিপর্যয়কর হবে, একটি অভিজ্ঞতার পর তা আর ব্যাখ্যার দরকার করে না।

বিভিন্নভাবে যাচাই–বাছাই করে এই যে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হল, এটাই হতে পারে একটা আদর্শ। শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন যেনো কোনো অবস্থায়ই পরে পরীক্ষামূলক উদ্যোগ বিবেচিত না হয়, এব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

শেষ কথা হচ্ছে এই, বিতর্কিত পরীক্ষা পদ্ধতির বদল হচ্ছে ভালো কথা, কিন্তু একেই উত্তরণের নিশ্চয়তা মনে করা ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে পঠন–পাঠনের মান যাচাই করা। এই পঠন–পাঠনে যদি গলদ থেকে যায়, অনেক গলদ এরই মাঝে কায়েমী হয়ে বসে বলেই আমাদের বিশ্বাস, পরীক্ষার কোনো পদ্ধতিই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। পরীক্ষার গলদ দূর করার সঙ্গে সঙ্গে পঠন–পাঠনের গলদ দূর করায় মন দেয়া দরকার। এ কাজটাই অধিকতর তাৎপর্যবহ।

—সালেহ চৌধুরী